রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা

জি. এম. রুহুল আমীন

সংঘবদ্ধ জীবন যাপন একে অপরের প্রতি দায়িত্ববান হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে। এ সংঘবদ্ধ জীবন ব্যবস্থা পরস্পরের মাঝে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ছোট ছোট এ সমাজ ব্যবস্থার ধারণা বিস্তৃতি লাভ করে রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। ভূখণ্ডগুলো নিজের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতিসত্তা টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম করে বিশ্বের বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কালের বিবর্তনে এ সমাজ ব্যবস্থার ধারণাও বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। অত্র প্রবন্ধে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা অবতরণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের পরিচয়

বাংলা ভাষায় রাষ্ট্র শব্দটি ইংরেজি **state** শব্দের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি **state** শব্দটি মূলত ল্যাটিন **status** শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হল অবস্থা। যা কখনো আইনানুগভাবে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এমন ব্যক্তিদের অস্তিত্ব থাকা, কখনো রাজার অবস্থা আবার কখনো বা প্রজাতন্ত্রের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ: বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত এক আবশ্যিক সংগঠনকে রাষ্ট্র বলে।

রাষ্ট্রপতি উইলসন বলেন, কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডে আইন অনুসারে সংগঠিত কোন জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে।

এরিস্টটল বলেন, রাষ্ট্র হল কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি যার উদ্দেশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করা।

সুতরাং রাষ্ট্র বলতে, এমন এক রাজনৈতিক সংগঠনকে বোঝায় যা কোন একটি ভৌগোলিক এলাকা ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে। রাষ্ট্র সাধারণত একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক সীমার ভিতর বসবাসকারী সমাজের সদস্যদের শাসনের জন্য নিয়ম-কানুন তৈরি করে। যদিও একথা ঠিক যে, রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পাওয়া না পাওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে, রাষ্ট্র হিসেবে তার উপর প্রভাব রাখা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির উপর।

ম্যাক্স ওয়েবারের মতানুসারে রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক সংগঠন যা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে আইনানুগ বলপ্রয়োগের সব মাধ্যমের উপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ রাখে, যাদের মধ্যে রয়েছে সশস্ত্রবাহিনী, নাগরিক, সমাজ, আমলাতন্ত্র, আদালত এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ব্যাপক অর্থে সরকার বা প্রাচীন-আধুনিক সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকেই রাষ্ট্র প্রত্যয়টির অংশ হিসেবে ধরা হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাদের সমন্বিত পদ্ধতির অংশ হয়ে ওঠাটা প্রথম স্পষ্টভাবে দেখা যায় ১৫ শতক নাগাদ। আর ঠিক সেসময়ই রাষ্ট্র প্রত্যয়টি তার আধুনিক অর্থ পরিগ্রহ করে। তাই রাষ্ট্র প্রত্যয়টি প্রায়ই নির্দিষ্ট করে শুধু আধুনিক রাজনৈতিক কাঠামোকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর স্বতন্ত্র পরিচয় থাকলেও তারা সম্পূর্ণভাবে সার্বভৌম নয়। এদের কর্তৃত্বের সীমা সেই সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যা একই সাথে আংশিক বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সমান সার্বভৌমত্ব থাকা সংশ্লিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রটির রূপরেখা নির্ধারণ করে। রাষ্ট্র কাঠামোর রূপ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে সংগঠিত হতে পারে, যেমন স্থানীয়, পৌর, প্রাদেশিক/আঞ্চলিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় এমনকি সাম্রাজ্য বা জাতি-সংস্থার মত আন্তর্জাতিক রূপেও তা থাকতে পারে।

চলতি ধারণা অনুযায়ী দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র প্রত্যয়গুলি প্রায়ই এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যেন তারা সমার্থবোধক; কিন্তু আরো সুচারুরূপে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

ক. দেশ বলতে ভৌগোলিক এলাকা বোঝানো হয়। যেমন, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান ইত্যাদি।
খ. জাতি বলতে সেই জনগণকে বোঝানো হয়, যাদের রীতিনীতি, পূর্বপুরুষ, ইতিহাস ইত্যাদি একই। যদিও বিশেষণ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শব্দদুটি দিয়ে সেইসব বিষয়কে বোঝানো হয় যেগুলো স্পষ্টতই রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট; যেমন, জাতীয় রাজধানী, আন্তর্জাতিক আইন।
গ. রাষ্ট্র সেই সব শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝায় যাদের একটি নির্দিষ্ট এলাকা ও জনগণের উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব আছে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

১. কন্সটিটুটিভ থিওরি অফ স্টেটহুড

ঊনিশ শতকে বিকাশ লাভ করা এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে কোনটি রাষ্ট্র আর কোনটি রাষ্ট্র নয়। এই তত্ত্বানুযায়ী কোন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা নির্ভর করে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির উপর। একারণে সদ্যজাত রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশ হয়ে উঠতে পারেনা বা আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য হতে পারেনা। একই সাথে স্বীকৃত রাষ্ট্রগুলোও ওই রাষ্ট্রের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকবেনা।
এই তত্ত্বের উল্লেখ্যযোগ্য একটি সমালোচনা হচ্ছে এই যে, এটি সেসব ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করে যেসব ক্ষেত্রে স্বীকৃত রাষ্ট্রসমূহের একাংশ নতুন রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু আরেক অংশ দেয় না। অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়াটা সংশ্লিষ্ট নতুন রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, সমালোচনার জবাবে এই মত দেন তত্ত্বের প্রস্তাবকদের কেউ কেউ। যাহোক, একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষেত্রে যেকোন মানদন্ড বেছে নিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্বার্থসংশ্লিষ্টতা থাকলেই একটি রাষ্ট্র নতুন রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতি দিতে পারে।

২. মন্টেভিডিও সম্মেলন

স্বীকৃতি পাওয়া প্রসঙ্গে ক্ষুদ্রজাতিসমূহ কর্তৃক উপস্থাপিত দলিলগুলোর অন্যতম একটি হলো মন্টেভিডিও সম্মেলনে সমঝোতা চুক্তি। মন্টেভিডিও সম্মেলনে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৩৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর । এতে স্বাক্ষর করে নিম্নোক্ত দেশগুলো, যুক্তরাষ্ট্র, হন্ডুরাস, এলসালভাদর, ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র, হাইতি, আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, ম্যাক্সিকো, পানামা, বলিভিয়া, গুয়েতেমালা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়ে, কলম্বিয়া, চিলি, পেরু এবং কিউবার সম্মতিতে। পরবর্তীতে যদিও এই সমঝোতা কোন আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। মন্টেভিডিও সমঝোতায় চারটি শর্ত আছে যা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেতে ইচ্ছুক "রাষ্ট্র"কে পূরণ করতে হবে।
ক. স্থায়ী জনগণ
খ. নির্ধারণকৃত এলাকা
গ. সরকার
ঘ. অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক তৈরির সক্ষমতা।
এই শর্তগুলো পূরণ সহজসাধ্য বলে, মন্টেভিডিও সমঝোতা কখনোই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, বরং বেশিরভাগ দেশ আদর্শ হিসেবে কন্সটিটুটিভ থিওরি অফ স্টেটহুডকেই ব্যবহার করে।

রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন

প্রাথমিক স্তরের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় যখনই ক্ষমতাকে টেকসইভাবে কেন্দ্রীভূত করা যায়। "কৃষি ও কলম" প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। কৃষি, উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদন ও তার সঞ্চয়কে সম্ভব করে তুলেছে। এটাই পর্যায়ক্রমে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব করে তুলেছে যারা কৃষি উদ্বৃত্তের মজুত নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করতো। একই সাথে এই কাজে সময় ব্যয় করায় তারা ক্রমেই তাদের নিজেদের জীবিকা নির্বাহী কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়াও রয়েছে লেখনীর বিকাশের ব্যাপারটি, যা প্রয়োজনীয় তথ্যের একত্রিত উপস্থাপন সম্ভব করেছে।
অনেক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্রের মূল সূত্র আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে প্রোথিত। সে সংস্কৃতি মানুষের বোধের সাথে সাথে সেই কাঠামোকে উন্নত করেছে যা আদি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষুদ্রসমাজের নজির, যেখানে দুর্বলের উপর সবলের দাপটই মুখ্য ছিলো। যাহোক, নৃবিজ্ঞানীদের মতে আদিবাসী গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে উল্লেখ করার মত কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ছিল না। আর সেটাই সমাজগুলোকে বহুস্তর বিশিষ্ট করে তুলেছিলো।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

রাষ্ট্র কখন ও কিভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অতীত ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কতগুলো মতবাদ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। ঐশী মতবাদ

২। বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ

৩। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

৪। সামাজিক চুক্তি মতবাদ ।

১. ঐশী মতবাদ

এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন সেন্ট অগাস্টিন, তিনি তার বিখ্যাত বই **The City Of God** এ ঐশী মতবাদ সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ। এ মতবাদে বলা হয়- বিধাতা বা স্রষ্টা স্বয়ং রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন এবং রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি শাসক প্রেরণ করেছেন। শাসক তাঁর প্রতিনিধি এবং তিনি তার কাজের জন্য একমাত্র স্রষ্টা বা বিধাতার নিকট দায়ী, জনগণের নিকট নয়। শাসক যেহেতু স্রষ্টার নির্দেশে কাজ করে, সেহেতু শাসকের আদেশ অমান্য করার অর্থ বিধাতার নির্দেশ অমান্য করা। এ মতবাদ অনুসারে শাসক একাধারে যেমন রাষ্ট্র প্রধান এবং অন্যদিকে তিনিই আবার ধর্মীয় প্রধান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ মতবাদকে বিপদজনক, অগণতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক বলে সমালোচনা করেন। তাদের মতে, যেখানে জনগণের নিকট শাসক দায়ী থাকে না, সেখানে স্বৈরশাসন সৃষ্টি হয়। এ মতবাদকে বিধাতার সৃষ্টিমূলক মতবাদও বলা হয়।

২. বল বা শক্তি প্রয়োগ মতবাদ

এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ওপেনহেইমার, ভলতেয়ারসহ বিখ্যাত বিজ্ঞানীগণ। এ মতবাদের মূল বক্তব্য হল- বল বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং শক্তির জোরে রাষ্ট্র টিকে আছে। এ মতবাদে বলা হয়, সমাজের বলশালী ব্যক্তিরা যুদ্ধ-বিগ্রহ বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্বলের উপর নিজেদের আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনকার্য পরিচালনা করে। এ মতবাদে আরও বলা হয়, সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। সমালোচকরা এ মতবাদকে অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও মারাত্মক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেন, শক্তির মাধ্যমেই যদি রাষ্ট্র টিকে থাকত তাহলে শক্তিশালী রাষ্ট্রের পাশাপাশি সামরিক দিক থেকে দুর্বল রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারত না। আসলে শক্তির জোড়ে নয় বরং সম্মতির ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গড়ে ওঠে এবং টিকে থাকে।

৩. ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ

এ মতবাদের মূল বক্তব্য হলো- রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। যেসব উপাদানের কার্যকারিতার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, সেগুলো হলো-সংস্কৃতির বন্ধন, রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপ। ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ সম্পর্কে ড. গার্নার বলেন, 'রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, বল প্রয়োগের মাধ্যমেও সৃষ্টি হয়নি বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে।' রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ অনেক বিজ্ঞানীর নিকট সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। তাদের মতে এ মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আসলে বর্তমানের রাষ্ট্র বহুযুগের বিবর্তনের ফল।

৪. সামাজিক চুক্তি মতবাদ

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় বিধির বিকাশ সংক্রান্ত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। যার মূল বক্তব্য হল- রাজনৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে সামাজিক চুক্তির ফলস্বরুপ। সমাজের বিবর্তনে মানুষের সচেতন ইচ্ছার উপর গুরুত্বারোপ ও ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করায় এ মতবাদ অনেক চিন্তাবিদের মধ্যেই আবেদন সৃষ্টি করে। জন লক, টমাস হবস, জ্যাঁ-জাক রুশো প্রমুখ এ চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন। তবে এ চুক্তির কারণ বিশ্লেষণে তাদের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। ১৭শ ও ১৮শ শতকে এ ধারণা পাশচাত্য দর্শন ও রাষ্ট্র চিন্তায় জনপ্রিয়তা লাভ করলেও প্রাচীন গ্রিসের সফিস্ট এবং চীনের মোজুর দর্শনেও এর আভাস পাওয়া যায়।

তাদের মতবাদসমূহ

হবসের মতবাদ

টমাস হবস তার **Leviathan** গ্রন্থে সামাজিক চুক্তির পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তার মতে, আদিম সমাজ ছিল বর্বরোচিত, যেখানে অধিকার বা ন্যায়ের ধারণা ছিল অনুপস্থিত, এবং আইনের ভিত্তি ছিল শক্তিপ্রয়োগ ও প্রতারণা। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে মানুষের মাঝে যুক্তিশীলতার উন্মেষ ঘটায় পরস্পরের সাথে এ মর্মে সমঝোতায় উপনীত হয় যে, একজন ঠিক ততটুকু স্বাধীনতা বা অধিকার ভোগ করবে যতটুকু স্বাধীনতা বা অধিকার সে অন্যকেও দিতে প্রস্তুত আছে। এর ভিত্তিতে একত্র হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের যে চুক্তি সম্পাদিত হল তা একটি সার্বভৌম ক্ষমতার সূচনা করে; সে ক্ষমতা একজন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর হতে পারে। এভাবে শান্তির নিশ্চয়তা প্রয়াসী মানুষ তাদের প্রাকৃতিক অধিকারকে একটি ক্ষমতার কাছে হস্তান্তর করে যা ব্যক্তিমানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করে ও সমাজকে সাধারণ কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি বা দল এ ক্ষমতা লাভ করে সে এই চুক্তির কোন পক্ষ নয়, বরং চুক্তির ফল। উল্লেখ্য যে, হবস কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনায় সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে তার ওপর গুরুত্ব দেননি; বরং প্রাকৃতিক রাষ্ট্রকে তিনি দেখতে চেয়েছেন সমাজ রাষ্ট্রের যুক্তিপূর্ণ পূর্বাবস্থা হিসাবে।

জন লকের মতবাদ

জন লক সামাজিক চুক্তির বিকাশের প্রশ্নে হবসের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন, যদিও তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক সমাজ গঠনের পূর্বে মানুষ বাস করত প্রকৃতির রাজ্যে। তবে তার মতে প্রাকৃতিক রাষ্ট্রে শান্তি ও যুক্তির সহাবস্থান ছিল, এবং মানুষেরা নিরন্তর বিবাদে লিপ্ত ছিল না বরং স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হত। এটা প্রাক-সামাজিক নয় বরং প্রাক-রাজনৈতিক। এটা আইনশূন্যও ছিলনা কারণ মানুষ প্রাকৃতিক আইনের অধীনে বাস করত, যেখানে সকলে স্বাধীন ও সমান, স্বাধীন হলেও তারা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। কিন্তু নানা কারণে প্রকৃতির রাজ্যে স্বাভাবিক আদর্শ থেকে মানুষের বিচ্যুতি ঘটলে সমান অধিকার ভোগ করতে বঞ্চিত হয়। ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার জন্য তারা সুসংহত সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। যদিও প্রত্যেকে স্বাধীন স্বনির্ভর ও সমান, তবু ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থেই স্বেচ্ছায় সর্বসম্মতভাবে একটি চুক্তিতে আসে। জন লক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেই চুক্তিকে দেখতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর মতে, যদিও নথিপত্রে এমন চুক্তির হদিস পাওয়া যায় না তবুও নথিতে নেই এমন অনেক ঘটনাই বাস্তব। এ চুক্তিকে এরূপ একটা ঘটনা বলে মনে করা যেতে পারে।

রুশোর মতবাদ

জ্যাঁ-জাক রুশো ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর দ্যু কোঁত্রা সোসিয়াল (ফরাসীঃ Du contrat social) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রুশোর মতবাদ প্রাকৃতিক সাম্য ধারণার উপর নির্ভরশীল, যেখানে মানুষ মাত্রই সমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তৃপ্ত। মানবিক জ্ঞানের উন্নতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে শ্রমের শ্রেণীবিভক্তি সূচিত হয় এবং মানব জাতির প্রাকৃতিক সুখকর অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে ধনী-দরিদ্র বিভাজন সৃষ্টি করে, ফলে রাষ্ট্রীয় সমাজ অত্যাবশ্যক হয়ে যায়।

রুশো বলেন, সমাজ গঠনের এমন একটা আদর্শ থাকতে হবে যাতে সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির জীবন ও সম্পদ সমবেত শক্তির সাহায্যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় আপন আদেশই পালন করবে ও আগের মতই স্বাধীন থাকবে ফলত এভাবেই সামাজিক চুক্তি বিকশিত হয়। এ চুক্তি কোন নিরঙ্কুশ শাসক তৈরি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমস্ত অধিকারকে সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমষ্টির নিকট সমুদয়ভাবে সমর্পণ করে। আবার সকল নাগরিক একটা সার্বভৌম কাঠামোর সমান অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অধীনে তা পুণরায় লাভ করে। প্রত্যেকে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে অথচ ব্যক্তিগত ভাবে কারো কাছে নত হবে না। ক্ষমতা এখানে ব্যক্তি বিশেষের নয় বরং পরস্পরের।

এ মতবাদের সমালোচনা

সমালোচকগণ সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথমত যে অভিযোগ উত্থাপন করেন তা হল, এ মতবাদের পক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কোন একটি বিশেষ সময়ে কিছু মানুষ চুক্তি করে সমাজ গঠন করলেও পরবর্তী প্রজন্ম যে সেটা অনুসরণ করছে সেটারও কোন যুক্তি নেই।

ডেভিড হিউম সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিপরীতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, পরিবারের ধারণার মধ্য দিয়েই সমাজ গড়ে উঠে ছিল। স্বাভাবিক জৈবপ্রবৃত্তি বশত নারী-পুরুষ একত্রিত হয়েছে, আর সেটাই সমাজ উৎপত্তির আদি কারণ। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। পারিবারিক একত্রে থাকার সুবিধা মানুষকে বৃহত্তর পরিসরে সমাজের চিন্তা বিকাশে সাহায্য করেছে। এমনি করে অনুভূত প্রয়োজনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক সমাজ, সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি কল্পনা মাত্র, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। সমাজের মত সরকার ব্যবস্থার ভিত্তিও প্রয়োজনের অনুভূতি। ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার প্রয়োজনেই সরকারের উদ্ভব।

সুতরাং কালের পরিক্রমায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার পরিচয়ও বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার ভিন্নতায় এর পরিচয়ও নানা আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন।

→ *লেখক*
কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন